শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
গুরুপূর্ণিমা তিথি
২০২৬

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
সুমিত্রা, নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

[illegible]

৬৫ তম বর্ষ ● শুভ গুরুপূর্ণিমা তিথি ১৪৩৩ সন ● দ্বিতীয় সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ	শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ	৩১
গীতার মর্ম (পরবর্তীঅংশ)	শ্রীদেবপ্রসাদ রায়	৩৫
অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী (পরবর্তী অংশ)	শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর	৩৭
হে জ্যোতির্ময়গুরুদেব	(শ্রী) নারায়ণ মিত্র	৩৯
শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরীমা ভক্তের অনুভবে—(৪র্থ পর্ব)	শ্রীসোমনাথ সরকার	৪১
'রাম নামকা রটন কর—'	শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক	৪৩
পুণ্য-পরশ-পুলক (২৩শ পর্ব)	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	৪৫
'জয়গুরু' ধ্বনি মাহাত্ম্য	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	৪৭
"চেতনার সন্ধান"	শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়	৫০
বিজ্ঞপ্তি		৫৩
বিশেষ ঘোষণা		৫৪
অনুভব (কবিতা)	শ্রীফকিরচন্দ্র শুকুল	৫৫
নমামি শ্রীমোহনানন্দ (কবিতা)	ডঃ আচার্য মুকুলবিকাশ মিশ্র	৫৫
"তোমারিপুলকহৃদয়ে লাগে" (সম্পাদকীয়)		৫৬

পরম শুভানুধ্যায়ী জনৈকা শিষ্যা

সতাং প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

ভাব সমাধির **একদিন পূর্ব্বে তিনি** যে সৎপ্রসঙ্গ করেন, তাহাতে এই কথাগুলি বলেন ঃ— "গুরু তখন **নিজেই নিজেকে তা আস্বাদনে**র জন্য শিষ্য হয়ে যান। তাই পরাদীক্ষা হলো প্রেম-দীক্ষা। এই দীক্ষায় **গুরুর ভিতর শিষ্য** এবং শিষ্যের ভিতর গুরু বাস করেন। শ্রীরাধার, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবিরল **অশ্রুধারা—সে কি নিজেরই** বিরহে নিজে ক্রন্দন নয়? তিনি যে জীবের সঙ্গে মিলতে পারছেন না—তাই এ **ক্রন্দন। কারণ** গুরু আর শিষ্য, ভক্ত আর ভগবান এই পরাদীক্ষায় তখন তো আর আলাদা বস্তু **থাকেন না**। তখন পরস্পরের জন্য পরস্পরের বিরহ অসীম উদ্বেল হয়ে ওঠে।

১২ই জানুয়ারী ১৯৫৪, অপরাহ্ন সাড়েতিনটা—কিয়ূল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ভাবসমাধির অব্যবহিত পরেই **শ্রীশ্রীম**হারাজ দেওঘর আশ্রম হয়ে ভাগলপুরে আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। আজ ১২ই জানুয়ারী কিয়ূল প্যাসেঞ্জারে ভাগলপুর হতে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করেছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে কিছুদূর যাব। সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে অজিত আমাদের শ্রীশ্রীমহারাজের কামরায় ডেকে নিয়ে গেল। কীর্ত্তন হবে। খোল, হামোনিয়াম তাঁর কামরায় গেছে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপক সঙ্গীতজ্ঞ 'রবিও' ছিল আমাদের সঙ্গে। বিশেষ করে তার রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবার ধরণটি বড় মধুর। শ্রীশ্রীমহারাজ অসিতকে দিয়ে রবিকেও তাঁর গাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। যেয়ে দেখি, তিনি উন্মনা। একবার জানালা খুলছেন একবার বন্ধ করছেন। একবার দূরবীণ দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছেন আবার পরক্ষণে রেখে দিচ্ছেন। ভিতরের কি একটা ভাব চেপে রাখবার জন্য তিনি অস্থির, চঞ্চল। আগে থেকেই রবি কে যে সব রবীন্দ্র সঙ্গীতগুলি গাইতে বলে রেখেছিলাম, সে তাই গেয়ে চলেছে ঃ—

"কাঁদালে মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে
পরাণে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিলে দিশা হারা।"
"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধুহে মোর রয়েছ দাঁড়ায়ে

দেখছি, এসব গান শুনে শ্রীশ্রীমহারাজ ক্রমেই আরও চঞ্চল হয়ে উঠছেন। আমার ভাই অধ্যাপক শোভনেন্দু আমার কাণে কাণে বললে ; "চল, পরের ষ্টেশনে আমরা নেমে যাই। আমাদের নিঃশ্বাস এখন তাঁর সহ্য হচ্ছে না। একাই থাকতে চান।" রবি একটা খুব সুন্দর গান আরম্ভ করেছিল—ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই গান অর্দ্ধসমাপ্ত রেখে সকলেই আমরা নেমে গেলাম। অজিত ও আমাদের সঙ্গে নেমে এল। আমাদের কামরায় ফিরে এসে আমরা তাঁর কথাতেই মগ্ন হয়ে রইলাম। তিনি নাই বা আমাদের

সহ্য করতে পারলেন, আমরা না হয় তাঁর গাড়ী থেকে নেমেই এলাম। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের আসন থেকে চলে যাবার সাধ্য কি তাঁর আছে? এবার কলকাতায় আঠারোবাড়ীতে তাঁর শুভজন্মদিনের ভাষণে তিনি বিল্বমঙ্গলের আখ্যানটি বলেছিলেন। সে সময়ে এই শ্লোকটিও বলেন ঃ—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎকৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে॥"

"হে কৃষ্ণ আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চপল গতিভঙ্গীতে চলে গেলে। কিন্তু এ আর আশ্চর্য্য কি! যদি আমার হৃদয় হতে নিষ্ক্রান্ত হতে পার তবেই তোমার পৌরুষ গণ্য করি।"

বললাম, "মহারাজ আমাদের সহ্য করতে পারছেন না, এ অনুমান ঠিক নয়। বরাবর লক্ষ্য করে আসছি, অজিত! তুমিও বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, সেই আঠারোবাড়ীর ভাব সমাধির পর থেকেই তিনি অমনি উতলা, উন্মনা হয়ে রয়েছেন।" দেওঘর থেকে ভাগলপুর আসবার পথে রাস্তায় মোটর বিগড়ে গেছিল, পৌঁছাতে রাত্রি হয়ে গেল। বড় গাড়ীটা—অমৃতবাজারের শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তিদের খারাপ হয়ে যাওয়ায় আমরা মহারাজের গাড়ীতেই আছি। বনপথ দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে, বনস্থলীতে যেন আগুন লেগে গেছে এমনই প্রভাময় অরুণ বর্ণে শাখাজালের অন্তরালে পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে। শুক্লা একাদশীতে তাঁর জন্মদিন গেছে, আজ পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীমহারাজ নীরবে নেই, আরও সব ভক্তদের সঙ্গে খুব হাসি গল্প করছেন। কিন্তু অন্য সময় তিনি যখন হাস্য করেন তখন সে হাসি দেখলেই হৃদয়ে ধ্বনিত হয় ঃ—ভাগবতের উক্তি—

"মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠনাথ মোহয়ন্নিব মায় য়া—"

শ্রীমদভাগবতের সেই তাঁর হাসির রূপবর্ণনা ঃ—"সেই মৃদুমধুর স্মিত হাস্য দর্শনে বিশ্বচরাচর আনন্দে মোহাভিভূত হয়।" কিন্তু আজকের তাঁর এই চেষ্টাকৃত হাসি আর এই সবগল্প—এ যেন কেবলই নিজেকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা। তাইজন্যে নীরবে ব্যথিত হৃদয় হতে ধ্বনিত হচ্ছিল ঃ—

"তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল?
বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখিজ'ল!
প্রভু! বুঝেছি মোরা তোমার এ যে নিগূঢ় ছলনা—
যে কথা তুমি বলিতে চাও, সে কথা তুমি বলোনা।"

সেবারে ভাব সমাধির পরেই ভাগলপুরে যেয়ে যে কয়েকদিন আমাদের নিকট ছিলেন, তিনি এই রকম ভাবেই ছিলেন। কতবার গুণ গুণ করে সুরের গুঞ্জন তুলে কীর্ত্তনে নিজে গাইবার কতই চেষ্টা করেন, কিন্তু সে প্রয়াস সফল হয় না। গান গাইতে বসলেই নয়নে জল আসে, গলা ভেঙ্গে যায়। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে রবিকে ইঙ্গিত করেন। "তুমি গাও।" আজও ট্রেনে যত কথা বলেন সৎ-প্রসঙ্গে, তার মাঝেও যেন এই ভাবেরই আবেশ ছিল। তাই জন্যে এই পূর্বাভাসটুকু বলে রাখলাম।

আমরা তাঁর গল্প করতে করতে যাচ্ছি, শ্রীশ্রীমহারাজ আবার আমাদের তাঁর কামরায় ডেকে পাঠালেন। সময় তখন বোধহয় বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। ট্রেন রামপুরহাট ষ্টেশন থেকে ছাড়লো। ভক্ত সমাগম এখনকার মত শেষ হয়েছে। বোধহয় সাঁইথিয়া এবং বোলপুরে আবার ভক্ত সমাগম হবে তাঁর দর্শনের জন্য। এখন আমরাই কয়েকজন ছাড়া তাঁর কামরায় বিশেষ কেউ নেই। ভক্ত আগমন উপস্থিত

মত শেষ হওয়ার পর তাঁর কামরার মেঝেটি মুছে পরিষ্কার করে ধুপকাঠি জ্বেলে দিয়েছি। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁর শ্রীচরণ দু'খানি প্রসারিত করে দিয়ে, নীরবে জানালা দিয়ে চেয়ে আছেন বাইরের দৃশ্যের দিকে। তাঁর রক্তিম চরণ-প্রান্তে বসে রয়েছি। কালের বালুবেলায় এই অমরাবতীর ক্ষণকালটুকু হারিয়ে কেন যেতে দেব? কতটুকুই বা এর স্থিতি! এখনই তো ভীড়ের কোলাহলে তা মিলিয়ে যাবে। তাই সাহসে ভর করে তাঁর চরণ পানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ—"আর একটু পরেই তো নেমে যাব। দূরে চলে যাবার সময় হয়ে এ'লো। কিন্তু দূরে যেয়েও কী করে আপনার সঙ্গে সর্ব্বদা যোগ রাখব?

শ্রীশ্রীমহারাজ ঃ—'যোগ তো মনে। এ দেহের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন নিজের যে এতপ্রিয় দেহ, তার সঙ্গেও তো তেমন যোগ থাকে না। আসল যোগ মনে। বাইরের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক নেই।"

শ্রীশ্রীমহারাজ এক কথায় আমাদের প্রশ্ন নাকচ করে দিলেন। কিন্তু আমাদের মনে ধ্বনিত হ'তে থাকলো, মানুষেরই দেহ প্রাকৃত, আত্মা নিত্য। তার দেহে অভিনিবেশ নিন্দনীয়। কিন্তু কৃষ্ণের 'দেহ দেহী'—ভেদ নাই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উক্তি; "কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যের সিন্ধু।" শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীঅঙ্গের প্রতি অনুপরমাণু চিন্ময়। এই সান্দ্রাঙ্গ সচ্চিদানন্দ ঘন মূর্ত্তি যত দর্শন হয় ততই "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।" কিন্তু এত কথা তাঁর সামনে বলি এমন সাধ্যই নাই। তাই বললাম ঃ—"মহারাজ যতই বলুন! "যোগ শুধু মনে।" তবু কিছুদিন আপনার দর্শন বিরহিত হলেই আমাদের দুরবস্থা এত হয় কেন? বিনা চেষ্টায় বিনা সাধনায় শুধু আপনার শ্রীচরণতলে থাকলেই আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব যে উচ্চলোকে থাকে—আবার সংসারে ফিরে এসে সেই রেশ চিরস্থায়ী কেন হয় না? কি করলে, কি ভাবে চললে সর্ব্বদা আপনার সহিত যোগ অবিচ্ছেদ হয়? এবং সেই রেশ স্থায়ী হয়। সংসারের নানা অসুন্দরতার মাঝে ফিরে যেয়েও সেই চিরসুন্দরের স্পর্শ কেমন করে অটুট থাকবে?"

শ্রীশ্রীমহারাজ ঃ—"যতক্ষণ একেবারে তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে না পারছ ততক্ষণ সংযোগ আর বিয়োগ আছে। বস্তুতঃ তিনি আর জীব দুই তো আলাদা নয়। তিনিই সর্ব্বভূতের মধ্যে লীলা করছেন। সকলের মধ্যে সেই তিনি। তাঁকে কি বলে বোঝাবে? তাঁকে শুধু 'সুন্দর' বললেই যে তাঁকেও সীমাবদ্ধ করা হয়। তিনি বিভু বস্তু, তাঁর সীমাকরণ করা সম্ভব নয়। এইমাত্র তুমি যা বললে—অসুন্দরের মাঝেও সুন্দরকে উপলব্ধি করা—সে কথাটাও একহিসাবে প্ল্যাটিটিউড (platitude) কথার কথা মাত্র। সেই সত্য দৃষ্টির বিকাশ হলে অসুন্দর বলে এই ত্রিভুবনে আর কিছুই থাকবে না। সব্বের মাঝেই তাঁকে দেখবে। তিনি সুন্দর, অসুন্দর সূক্ষ্ম, স্থূল—সবই তিনি। তিনি অণু হতেও অণু—কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করে—তার চেয়েও সূক্ষ্ম। আবার তিনিই মহৎ হতেও মহৎ "অণরোণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" কাজেই তাঁর সীমাকরণ করা সম্ভবপর নয়। তার চেয়ে সদাসর্ব্বদা তাঁকেই চিন্তা কর। অবিচ্ছিন্ন অবিশ্রান্ত তাঁর স্মরণে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হবে। তখন আর চেষ্টা করে তোমাকে ভালো হতে হবে না। ভালো হয়েই যাবে। তাঁরই উপর সব নির্ভর কর, সব ভার ছেড়ে দাও। তুমি তাঁকে দেখবে, তাঁকে সম্ভোগ করবে, এইকামনার মধ্যেও স্ব-সুখময়ী বাসনা আছে। আর এ কামনাও বিসর্জন দিয়ে তাঁর উপর সব ভার ফেলে দিয়ে তাঁর যখন ইচ্ছা তিনি দর্শন দেবেন। এই মনোভাবই অবলম্বন কর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমা—বিড়ালছানার মাকে ধরা আর বাঁদরছানার মাকে ধরা মনে আছে তো? তুমি চেষ্টা করে তাঁকে আর ধরবে কি! তাঁর

উপর সব ভার ছেড়ে দিলে তিনি নিজে এসে তখন হাত ধরবেন। দু'টি আছে। একটি পূর্ব্বরাগ আর একটি অনুরাগ। পূর্ব্বরাগেও 'আমিত্ব' বোধ একেবারে যায় না। পূর্ব্বরাগেও স্ব-সুখময়ী বাসনা থাকে। আমি তাঁকে সম্ভোগ করব। আমার কত রূপ কত গুণ—আমি নিজেকে নানাবিধরূপে সজ্জিত করি যাতে তাঁর উপযুক্ত হতে পারি, তাঁর মনে ধরে। এরূপ মনোভাব হলো পূর্ব্বরাগের। আর অনুরাগে এ সকল বোধই লুপ্ত হয়ে যায়। তিনি দয়া করে ডেকেছেন। তাঁর বেণুরবের আহ্বানে সাজ, অসাজ, ভালো মন্দ, যোগ্যতা অযোগ্যতা সকলই নিশ্চিত হয়ে মুছে গেছে। যিনি বেনুদ্বারে আকর্ষণ করেছেন তিনিই তাঁর অহৈতুকী করুণায় গ্রহণ করবেন। সাজের আর কিসের দরকার? আকুলিত চিত্ত সব চিন্তা ভুলে একমুখী হয়ে শুধু তাঁর পানে ছুটে চলেছে। এইটি হবে তখনই যখন নিজের নিজত্ব একেবারে মুছে যাবে। নিজেকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা, নিজের যোগ্য অযোগ্য বিচার—নিজে তাঁকে দেখব তাঁকে সম্ভোগ করব, এসব বাসনাও আর থাকবেনা। তাঁর ইচ্ছা যখন কাছে ডাকবেন, না হয় যদি ইচ্ছা, ডাকবেন না। তাঁর যা খুসী। আমার চাইবার কিছুই নেই।"

শ্রীশ্রীমহারাজ যেন ভাবময় হয়ে কথাগুলি বলছিলেন। এখন ক্ষণকাল চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েচেন। চলন্তট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিও যেন চলমান। "পরমপ্রজ্ঞা" আর এই অনন্ত গতিশীলতা একই। তাই কি মহারাজ এত দ্রুত গতিশীলতাই ভালোবাসেন। অবিশ্রান্ত গতির মাঝেই যেন তাঁর আনন্দ। পাছে তিনি চুপ করে যান, আর কিছু না বলেন তাই ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম ঃ—"আচ্ছা বাবা, শ্রীপাদনিত্যানন্দ—তিনি তো মহাপ্রভুর অভিন্ন কলেবর ছিলেন। তাঁকে পর্যন্ত মহাপ্রভু কতবার নিষেধ করে বলেছিলেন: ঃ "শ্রীপাদ! জীব উদ্ধারের কার্য্য ফেলে বার বার আমাকে দর্শন করতে ছুটে এসোনা।" কিন্তু তবু তো শ্রীনিত্যানন্দ দূরে থাকতে পারতেন না। তাঁরই যদি এই রূপ হয় তবে অতিক্ষুদ্র জীব আমাদের কী গতি হবে? আপনি বলে দিন। আমাদের আপনার নিকট হতে দূরে গেলেই মনে হয়, এত যে দেখে এলাম তবু কখনো যেন দেখিনি।"

০০০

"ভক্তের হৃদয় আমার। আমার হৃদয় ভক্তের। তারাও আমাকে ছাড়া অপর কিছু জানে না। আমিও তাদের ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সখ্য সম্বন্ধ। সখাই অভিন্নহৃদয়। অনেকসময় পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, পুত্র, কন্যা কাউকে যা বলতে পারা যায় না, তা অসঙ্কোচে সখাকে খুলে বলা যায়। সখার কাছে কোনো দূরত্ব, কোনো সঙ্কোচ নেই।।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

গীতার মর্ম (পরবর্তীঅংশ)

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

সমস্ত জীবন দিয়ে সেই একটি বস্তুকে চাইতে হবে। জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর পেতে হবে তব পরিচয়/তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে সকল শঙ্কা করি জয়। ভালই হয়েছে ঝঙ্কার বায়ে/প্রলয়ের জটা পড়েছে জড়ায়ে, ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহ বাহনে—/মিলন যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্র শিখার দাহনে।/তিমির রাত্রি পোহায়ে/মহাসম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে/মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।। সমস্ত মনপ্রাণ সমগ্রভাবে সেই একটি বস্তুর চিন্তার ও ধ্যানে ভরপুর রইবে। অন্যান্য যাবতীয় বাস্তব প্রাপ্তিতে হর্ষ বা নাশে শোক থাকবে না। কারণ তারা সকলেই অশোচ্য। যে সকল অশোচ্য বস্তুর অভাবের জন্য এক সময় দুঃখ দুর্বিষহ মনে হত, সেই সকল বস্তুর অভাব নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় হবে। তাই আমরা শুনি যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে—যে অবস্থায় অবস্থিতি করে কোন দুঃসহ দুঃখেই বিচলিত হন না।'

যমুনার তীরে সাধন ভজনরত এক সাধু যখন পায়ে ঠেকা পরশ পাথর খানাকে পায়ে ঠেলে বালির তলে রাখতেন, ''যদি কভু লাগে দানে''—এই মনে করে, তখন বুঝতে হবে ''যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মাননামণি', এমন এক ধন তিনি পেয়েছেন। সেই জন্যই যং লব্ধা-চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকম্ ততঃ—যে অবস্থা লাভ করে যোগী অন্য লাভকে অধিক বলে মনে করেন না। যা পেলে সব ধন তুচ্ছ, সব দুঃখ উপেক্ষণীয় সেই দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে চিত্তকে তিনি তুলেছেন; পরা শান্তির আঙিনায় তিনি প্রবেশ করেছেন।

সেই দ্বন্দ্বাতীত ভূমির স্বরূপ কি এবং কী উপায়ে তা পেতে হবে, সমস্ত গীতা ভরে সেই কথা। একই কথা বলা হয়েছে দ্বাদশ অধ্যায়ে—ময্যেব মন আধৎ স্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।। (১২/৮)

—হে অর্জুন, তুমি আমাতেই মন বুদ্ধি সংলগ্ন কর। তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে, এতে সংশয়ের অবকাশ নেই। একই কথা বলেছেন দৃঢ়ভাবে, মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।। (১৮/৬৫)

প্রতিজ্ঞা করে তিনি বলেছেন—অর্জুন, তুমি আমাতে মন রাখ, আমাতেই অনুরাগ সম্পন্ন হও, আমার উদ্দেশ্যেই সমস্ত কর, আমার কাছে মাথা নীচু করে রাখ—তুমি আমাকেই পাবে। কারণ তুমি আমার পরম প্রিয়জন।

ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও অষ্টাদশ—এই তিন অধ্যায়ে তিন ষট্‌কের তিনটি ভক্তির মধ্যে একই ভাব দেখা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বীজমন্ত্র তিন ষট্‌কের মধ্য দিয়ে পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়ে সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ এই মন্ত্রে ফলবান হয়েছে। কীলকের ১৮/৬৩ মতে এই ফলের প্রাপ্তিতেই সকল রহস্যের অর্গল খুলে গিয়েছে। ভগবান বলছেন, অর্জুন যুদ্ধ করা না করা কোনটাই ভেবো না। আগে নিজেকে আমাকে সমর্পণ কর। আমার হয়ে যাও। তারপর আমি যা করাই, তাই কর। এছাড়া আর

সকল হিসাব নিকাশ ছাড়। শোকের কারণ আর থাকবে না। যেগুলিকে জীবনের পরম প্রাপ্য বস্তু (End) মনে করে বসে আছ, সেগুলিকে পরম বস্তু লাভের উপায় স্বরূপ (Means to a greater end) বলে গ্রহণ কর। তাহলেই শোকের হেতু চলে যাবে। অশোচ্যানন্ব শোচঃ তাই তো তোমার দুঃখ দৈন্য বিষাদ। তুমি যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং, ততঃ তাঁকে খোঁজ পরাশান্তির উৎস নেমে আসবে।

অশোচ্যের জন্য শোক হওয়ার জন্যই বিষাদযোগ। যাঁকে না পেলে জীবন বাস্তবিকই শোচ্য, তাঁর জন্য নিজেকে সঁপে দিলেই মোক্ষ যোগ।

মানুষের জীবনকে যদি পর্যালোচনা করি, বিশ্বসৃষ্টিকে যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখি, যেমন যেমন চৈতন্য বাড়ছে, তেমন তেমন দুঃখ বাড়ছে, কষ্ট বাড়ছে। তাহলে চৈতন্য লাভ বারবার তো কোন প্রয়োজন নেই, অচেতন হয়ে থাকাইতো কাম্য। পাথরের যেমন, কোন দুঃখ নেই। তারপর যেই একটু চৈতন্য হল, পশুস্তরে এলাম, সেখানে প্রথম দুঃখ কষ্ট দেখা দিল। সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদির কষ্ট। কিন্তু যেই মানুষের স্তরে এলাম, তখন কতরকমের বিচিত্র দুঃখ আমাদের ঘিরে ধরছে ক্রমশঃ। অথচ মানুষ কী পশুর চেয়ে উন্নত নয় চেতনার দিক দিয়ে? সুতরাং চেতনা যেমন রয়েছে, দুঃখ, বেদনা, পীড়াও সেই সঙ্গে রয়েছে। অর্জুন তামসিকতায় নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, চোখ বুজতে চেয়েছিলেন এই সংকট দেখে। যখন ভগবান তাঁকে জাগালেন, তিনি দেখলেন ভয়ানক সব দ্বন্দ্ব।

সেইজন্য ভগবান তাঁকে ভরসা দিচ্ছেন, বলছেন, একটা কাজ করো আগে, 'তিতিক্ষস্ব ভারত; প্রথম তিতিক্ষা করো, সহ্য করতে শেখো, অত আকুল হয়োনা। এই আকুলতা তোমার দুঃখের উপলব্ধি থেকে হচ্ছে। বুঝলাম তোমার গায়ের উপর চারিদিক হতে নানারকম আঘাত তোমার বা মার এসে পড়ছে। সেই সে আঘাত তোমার গায়ের উপর এসে পড়ছে তা একটু সহ্য করে থেকো; কেন না এটা চিরকাল থাকবে না; আজ আছে, কাল নেই, 'আগমাপায়িনো অনিত্যাঃ।' কিন্তু তুমি এটাকেই মনে করছ যেন চিরকালের জিনিস। দুঃখটাকে, শোকটাকে এমন বড় করে দেখছ যে, তুমি মনে করছ এইটেই যেন চিরন্তন, এর বুঝি আর কোনোদিন শেষ নেই। কিন্তু সবই আজ আছে, কাল নেই, দুঃখের বেলাতেও তাই। অতএব 'তান তিতিক্ষস্ব ভারত', আকুল হয়ো না। এই হল 'ধীরতা'; যা সর্বাগ্রে অর্জন করতে হবে, সাধনার পথে ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি' (১৩)। গীতা শুধু তত্ত্বের নয়, সাধনারও পথ নির্দেশক। সেই গীতায় শ্রীভগবানের প্রথম আদেশের বজ্র নির্ঘোষে আমাদের সাধন-জীবনে প্রথম জাগরণ, আমাদের উদ্বোধন। উদ্বুদ্ধ হবার পর এবার আদেশ পেলাম—'তান্ তিতিক্ষস্ব'। সাধনার পথে তাই গোড়াতেই শিখতে হবে তিতিক্ষা।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুর্ষভ।
সমদুঃখ সুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে॥ ২/১৫

পুরুষর্ষভ—পুরুষশ্রেষ্ঠ। এতে—এই শীতোষ্ণাদি, কল্পতে—উপযোগী হন।

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! যে ধীর ব্যক্তির দুঃখে সুখে সমান জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি বা বিষয়স্পর্শ যাঁকে ব্যথিত বা বিচলিত করতে পারেনা, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী॥

ব্যাখ্যা—যেমন রক্তবর্ণ জবাকুসুম নির্মল স্ফটিকের নিকটে থাকলে জবার রক্ত আভা স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলে মনে হয়, সেইরকম সুখ দুঃখরূপ অন্তঃকরণের (মন; বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত) ধর্ম, গুণ-কর্মবর্জিত স্বচ্ছ আত্মাতে ভ্রমবশতঃ আরোপিত হয়ে থাকে।

ক্রমশঃ

অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী (পরবর্তী অংশ)

শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর

ওই যে সেবার!—মনে পড়লেও গা শিউরে ওঠে! কেন? কেন? কোন্ সময়ের কথা বলছ তুমি?

তখন শীতের আগমনী শুনেই যেন শিলং চলে আসতেন মহারাজজী। সেবারেও এসেছেন—সেটা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি বা শেষ দিককার একটা সময়। একী গুরুদের হঠাৎ এক গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলেন; বাড়ির সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হলেন। গুরু মহারাজজী তাঁর কারণে কাউকে চিন্তায় ফেলতে চাইতেন না বা তাঁর বিশ্বাস ছিল অসুখ যোগীদের হয়না হয় ভোগীদের। এই ব্যাপারে সবাই চুপচাপ। বেশি লোক জানাজানি হওয়াটাও ঠিক নয়; পরিবেশ তৈরি হবে, তাছাড়া সর্বক্ষণই নিন্দুক, দুর্জন মানুষজন মুখিয়েই আছে কীভাবে নানা গুজব রটিয়ে ধর্মীয় আবহটাকে নষ্ট করা যায়। বিশ্বাসী, বিচক্ষণ কিছু বয়স্ক মানুষের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন অবনীমোহন। অনেক বিচার বিবেচনার পর ঠিক হল, বিশাল ভক্তমণ্ডলীকে কিছুই জানানো হবে না—অন্ততঃ তক্ষুনি। আতঙ্কের কালো মেঘ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তাহ'লে।

শিলং এর কোনও নামজাদা ডাক্তারের কাছেও যাওয়া যাবেনা এই একই কারণে। মিলিটারী হাসপাতাল তখনো বৃহত্তর শিলং-এর অংশ হয়ে ওঠেনি। শহরের কিছুটা বাইরেই যেন জায়গাটা, যেহেতু সৈন্যদের হাসপাতাল, তাই ভালো ডাক্তারের অভাব নেই সেখানে আর ডাক্তারী পরীক্ষার যাবতীর সরঞ্জাম, ব্যবস্থাও খুব ভালো। তাই সেখানেই যাওয়া ঠিক হলো। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবেন স্বয়ং অবনীমোহন—সঙ্গে থাকবেন না তৃতীয় আর কেউ। বাদ সাধলেন স্বয়ং মহারাজজী, 'নানা; আমি যাবনা কোথাও। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, তোমরা দেখো। তোমরা তো জানো না ডাক্তারী ওষুধ খেলেই আমার বমি হয়ে যায়।' তাঁকে বোঝানোর ভার অবনীমোহনের ওপরেই, 'ঠিক আছে! ওষুধ যে দেবেই এমনতো কোনো কথা নেই। কিন্তু পরীক্ষাগুলোতো করে নেওয়া দরকার। শরীরের অবস্থাটা ঠিকমত বুঝে নিতে হবে তো গুরুদের।'

অনেক কথা, অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর, শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হলেন মহারাজজী। তবে ঔষধ সেবন? নৈব নৈব চ। হাসপাতালের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে নিলেন অবনীমোহন। নির্দিষ্ট দিনে গেলেন মহারাজজীকে নিয়ে। ডাক্তার চোপড়া,—হুমহুমে গলার আওয়াজ, পাথুরে থামের মত শক্ত, কালো মুসকো জোয়ান—গোঁফের জায়গায় যেন কাবুলী বেড়ালের ল্যাজ। অসুবিধেটা ফুসফুসে। এদিকে কীর্তনের আধিক্য। শুনেই গর্জন; নেহি, নেহি। গানা উনা কীর্তন একদম বন্ধ বন্ধ এখন। বিপন্ন চোখে অবনীমোহনের দিকে দৃক্‌পাত মহারাজজীর।... এক্স রে করা হলো,—ফল জানা যাবে কয়েকদিন পর।

মাঝের দিনগুলি সবার খুব উৎকণ্ঠায় কাটল। মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে অনিদ্র রজনী খাবার তেতো। মহারাজজীর কিন্তু কোনো হেলদোল নেই—এ সব চলছে আগের মতো—কীর্তন ভক্তসমাগম।

জোর করে স্বাভাবিক থাকতে হচ্ছে সবাইকে। তারপর এলো সেই দিন। অবনীমোহন একাই গেলেন মিলিটারী হাসপাতালে। এক্সরে সামনে ধরে চোপড়া গম্ভীর মুখে জানালেন; রিপোর্টের অসুবিধার কথা। বললেন, 'এক্ষুনি ভর্তি করে দিন ওনাকে।' সে আর এক টানাটানি। মহারাজজী কিছুতেই ভর্তি হবেন না হাসপাতালে। অগত্যা ওষুধের এক দীর্ঘ তালিকা ধরিয়ে দিলেন ডাক্তার, সেই সঙ্গে যেন বিশাল নিষেধাজ্ঞা; না কীর্তন, না পুজো, না যজ্ঞ, না লোক সমাগম। আর অনেকটা ছানা তো খেতেই হবে। কিছুদিন পরে হবে আবার পরীক্ষা।

মাথায় ভেঙে পড়লো যেন একসঙ্গে শতাধিক বাজ। কী করে এসব নিষেধ মানানো যাবে মহারাজজীকে? শরীরের দোহাই দিয়ে যখন কীর্তন, পুজো আর অন্যান্য কাজকর্ম করতে বারণ করা হলো, উনি শুধু মৃদু হেসে বললেন, 'ভেবোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ছানা দেওয়া হল যখন, বললেন; এতো খেলে আমার বমি হয়ে যাবে।' হলোও ঠিক তাই। কঠিন সাধন নিয়ম, স্বল্পাহারে অভ্যস্ত সাধকের এসব অত্যাচার বলেই তো বোধ হবে। ওষুধপত্র খাওয়ানো গেল না সেই একই কারণে।

যথারীতি চলল কীর্তন, চলল যজ্ঞ, পুজো, ভোরবেলায় বাগানে পায়চারি, সন্ধ্যায় ভক্তসমাগম—মহারাজজী এর কোনটাই বাদ দিলেন না। পুজোর পর অর্ঘ্যহাতে যখন এগিয়ে আসেন চোখে ঘনায় কেমন যেন ঘোর দাঁড়িয়ে থাকেন কোন্ দূরের দিকে তাকিয়ে, কপোলে অশ্রুর ধারা। হাতের অর্ঘ্য এগিয়ে দিতেই সামনে যখন পড়ে যায় ফুল মহারাজজী নিজের মধ্যে ফিরে আসেন তখন।

দ্বিতীয় চেকআপের দিন মহারাজজীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন অবনীমোহন। ডাক্তার চোপড়াকে পুঙ্খনাপুঙ্খ জানানো হল সব ঘটনা। ডাক্তার অসহায়ের মত দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে ফাঁসির আসামীকে নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে মহারাজজীকে নিয়ে গেলেন এক্সরের ঘরে। পরীক্ষা করা হল, একবার নয়, বারবার। ইতিমধ্যে আরও নতুন প্রযুক্তি এসে গেছে মিলিটারী হাসপাতালে। আর সেই সব পরীক্ষার ফল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার চোপড়া একেবারে চুপ—কে হরণ করল কথা বলার শক্তি? চোখ দুটো যেন ঠিকরে বার হয়ে আসবে।

বাড়ি ফিরে ঘনিষ্ঠ মহলে সবকিছু খুলে বলতে গিয়ে একেবারে ফুঁপিয়ে উঠলেন অবনীমোহন। কী হল? শেষ সময় এসে গেছে,... সর্বনাশ দাঁড়িয়েছে শিয়রে?... না না, একেবারেই তার উল্টো। প্রত্যেকবারের পরীক্ষাতেই ছবি একেবারে পরিষ্কার, অসুবিধার কোনও চিহ্ন মাত্র নেই। পাথর যেন নেমে গেল বুকের ওপর থেকে—অমারাত্রির শেষে প্রসন্ন সূর্যোদয়। চললো কীর্তন, চললল পুজো, যাগযজ্ঞ, ভক্তমণ্ডলীর আবেগমথিত ভক্তির প্রকাশ, প্রবল উৎসাহ-দীক্ষাদান।

দিন কয়েক পর ডক্তার চোপড়া স্বয়ং হাজির, 'মোহনানন্দে'—অতি ঘটনার সন্ন্যাসী নায়ককে আরেকবার স্বচক্ষে দেখতে। সন্ধ্যা—সবাই তখন প্রণাম করছেন মহারাজজীকে। ডাক্তার সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন চরণে। বেশ খানিকাটা পরে উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন মহারাজজীর দিকে,—দু'চোখে জল। এ' কাকে দেখছেন উনি? কোনো মানুষ,—

নাকি কোনো দৈবী উপস্থিতি রয়েছেন সামনে।

'ভবে সেই তো পরমানন্দ।'

কোলকাতা থেকে এক শিষ্য পাঠিয়েছিলেন প্রচুর আম। 'চোপড়াকে চুপড়ি ভ'রে আম দিয়ে দাও;' হাসি-মুখে বললেন মহারাজজী।

ক্রমশঃ

হে জ্যোতির্ময়গুরুদেব

(শ্রী) নারায়ণ মিত্র

হে গুরুদেব শুধুমাত্র তোমার কৃপায় এই অসুস্থ অবস্থায়ও যে আমি নিজের তাগিদে কিছু স্মৃতিচারণ করতে বসেছি এর জন্য তোমাকে জানাই আমার শত কোটি প্রণাম।

আমার বাবা ও মা ছিলেন খুব গুরুভক্ত আর তাই আমাকেও খুব ছোট বয়সেই তাঁরা মহারাজজীর শ্রীচরণতলে সমর্পণ করেন। দীক্ষা হওয়ার পর থেকেই যে কত গুরুসঙ্গ করেছি বা তিনি করিয়েছেন সে সব কথা খাতার পাতায় লিখে শেষ করা যাবে না; তাই বেশীরভাগটাই মনের পাতায় পুরে রাখলাম। গুরুমহারাজজীর দুর্লভ সান্নিধ্যে আমার জীবন ধন্য হওয়ায় আমি পার্থিব অনেক কিছুই অনায়াসেই পেয়ে গেছি। মন্ত্র-জপ এসবের থেকে আমার মন বেশি আকৃষ্ট হত গুরু মহারাজজীর স্বর্গীয় সাধুর সঙ্গ পেতে।

তাঁর অপ্রকটকালের শূন্যতা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক; হারানো দিনের স্মৃতির মালা গেঁথে গেঁথে এখন,—"দিন (কাটছে) মোর একা একা।" আজ সেই দিনগুলির স্মরণ-মন্থন-চিন্তন ছাড়া আমার আর কোনও কাজ নেই। আমার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার এখন উল্লেখ করছি। ১৯৯২ সালে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ সারাদেশে খুব অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল—সেই সময় গুরুমহারাজজী বর্ধমান থেকে হঠাৎ পুরীর আশ্রমে অজ্ঞাতবাসে চলে যান। আমি অন্য এক শিষ্য মারফৎ জানতে পারি সেকথা এবং আমাকে অন্য কাউকে জানাতে নিষেধ করে তখন সারা কোলকাতায় কার্ফিউ চলছে। আমি বাড়িতে পৌঁছে আমার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে চলে যাই; স্টেশনে পৌঁছে শুনলাম যে পুরীর সকল ট্রেন বাতিল, কেবল রাত্রি দশটায় শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেস ছাড়বে। ট্রেনে উঠলাম—দেখলাম মাত্র দশ-পনের জন যাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। ট্রেন ছাড়া মাত্র দুজন টিকিট কালেক্টর এসে বলল যে সবাই যেন আমরা A/C 111 টায়ার বগিতে চলে যাই। সেখানে কিছু R.P.F প্রহরায় ছিল। যাই হোক শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর কৃপায় পরের দিন ভোর বেলায় পুরী পৌঁছলাম পুরী হোটেলও ফাঁকা ছিল, সেখানেই উঠলাম। স্নান সারার পরেই গুরুমহারাজজীকে দেখবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আশ্রমে পৌঁছে দেখলাম তিনি নিত্য পূজা সেরে সবে প্রণাম নিতে বসেছেন, মাত্র দশ/বারজন হবেন। আমরা প্রণাম করার পর তিনি সীতেন্দু কাকা কে বললেন আমাদের জন্য আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। সীতেন্দু কাকাও শ্রীগুরুর আদেশে আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অল্প সংখ্যক লোকের প্রনাম, তাই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে গুরুমহারাজজী কীর্তন শুরু করলেন। আজও আমার একটি গানের লাইন মাঝে মাঝেই মনে পড়ে—

"এইতো তোমার আলোক ধেনু।
সূর্য্যতারা দলে দলে, কোথায় বসে
বাজাও বেনু..."

কীর্তন শেষে আমরা গুটি কয়েকজন লোক প্রসাদ গ্রহণ করলাম।

এত অল্প কয়েকজন, জনসমাগম প্রায় নেই বললেই চলে—আমরা যেহেতু এরকমটা দেখে অভ্যস্ত নই—এ যেন এক বিরল দৃশ্য। প্রথম প্রথম তিন-চারদিন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী সমুদ্রতটে বৈকালিক ভ্রমন করেননি। তারপর অবশ্যই সমুদ্র তীরে বেড়াতে যাওয়া শুরু করেন। নিত্য সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ভজন করতেন। ভজন শেষ হতে হতে প্রায় রাত ন'টা বাজত। এইভাবে দিন-কয়েক অতিক্রান্ত হলে, কোলকাতা থেকে আবার কয়েকজন ভক্ত শিষ্য খবর পেয়ে হাজির হলেন।

আশ্রমে ছয়দিন অবস্থানের পর সপ্তম দিনে গুরুমহারাজজী খড়্গপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন—এইরকমই পরিকল্পনা সেই অনুযায়ী ক্যান্টিন পরিচালিকাকে ডেকে বলে দেওয়া হল পরের দিন সকালে যাঁরা যাঁরা রওনা হবেন, সবার জন্য সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে ফ্যানা ভাত, গাওয়া ঘী ও ছানার কাটলেট যেন করে দেন। ঠিক সকাল নটায় গুরুমহারাজজী খড়্গপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

আমরা থেকে গিয়েছিলাম। এরপর আমরা মহাপ্রভু শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে মন্দিরে গেলাম এবং রাত্রে শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে চড়ে কোলকাতায় ফিরলাম। জীবনে তাঁর সঙ্গ পাবার সুযোগ পেয়েছি অনেকবার, কিন্তু এবারেরটা যেন চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

আমি ও আমার পরিবারের সবাই শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর শ্রীচরণে জানাই শতকোটি সশ্রদ্ধ প্রণাম 'দেবী মা'কেও শতকোটি প্রণাম।

ওগো সুন্দর দেবতা, বিশ্ববীনাতে বাজে তব নাম, লহ প্রাণের প্রণাম।

৩০০

"অপূর্ণ জগতে সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। প্রতিকূলতা অনেকসময় তা হতে দেয় না, বাধা দেয়। কোনো একটি সৎ ইচ্ছা পূর্ণ করতে হলে তিনটি শক্তির প্রয়োজন। প্রথম— পূর্বজন্মের সংস্কার থাকা চাই, দ্বিতীয়— আত্যন্তিক চেষ্টা থাকা চাই, তৃতীয়— ভগবদ্‌কৃপা থাকা চাই। কারও হয়তো সংস্কার আছে, চেষ্টা আছে, তবু ভগবদ্‌কৃপা না পাওয়ায় অসৎ সঙ্গে পড়ে সে তার চেষ্টা ও সংস্কার হারিয়ে ফেললো। তিনটি যার একত্র হয়, তার মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরীমা ভক্তের অনুভবে—(চতুর্থ পর্ব)

শ্রীসোমনাথ সরকার

শঙ্কর কয়েকদিন চলার পর ওঁকারনাথে এসে পৌঁছলেন। একটা বিশাল শৈলশৃঙ্গ নর্মদাকে পরিবেষ্টন করে, ওঁ আকৃতি ধারণ করেছে। শুনলেন পুরাকালে রাজা মান্ধাতা এইস্থানে রাজত্ব করতেন।

শঙ্কর ওঁকারনাথের শিবলিঙ্গ (বর্তমানে ওঁকারেশ্বর) দর্শন করে পুজো করলেন। শুনলেন এখান থেকে কিছুদূরে নর্মদার তীরে 'মহাকাল' নামক আর এক জ্যোতির্লিঙ্গ বিরাজমান।

ওঁকারনাথের নিম্নে একটি গৃহে কয়েকজন সন্ন্যাসী বাস করেন। শঙ্কর তাঁহাদের যোগী গোবিন্দপাদের কথা জানতে চাইলেন এবং শঙ্কর সুদুর কেরল থেকে আস্‌ছেন—এই কথা জেনে বিস্মিতও হলেন। তিনি শঙ্করকে বললেন সামনের দিকে একটা গুহা আছে, তারমধ্যে গোবিন্দযোগী আছেন। তবে তিনিই পতঞ্জলীদেব কিনা, সেটা তাঁর জানা নেই। এখানে কয়েকজন সন্ন্যাসী অনেকদিন যাবৎ গোবিন্দযোগীর সমাধিভঙ্গের জন্য অপেক্ষারত আছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর সমাধি ভঙ্গ হয় নি।

শঙ্কর গুহার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে প্রদীপের আলোয় দেখলেন, এক দীর্ঘকায় কঙ্কালসার দীর্ঘজটাবৃত যোগীপুরুষ পদ্মাসনে সমাধিস্থ অবস্থায় রয়েছেন। শঙ্কর নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন। চোখের জলে শঙ্করের বুক ভেসে যেতে লাগল। আবেগে আপ্লুত হয়ে শঙ্কর করজোড়ে স্তব করতে লাগলেন; "আপনি মুনি শ্রেষ্ঠ পতঞ্জলীদেব-আপনি শরণাগতকে ব্রহ্মজ্ঞান দেবার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন; আপনাকে প্রণাম জানাই।"

শঙ্করের এক সুললিত স্তুতিতে গোবিন্দপাদের দেহ ধীরে ধীরে কম্পিত হতে লাগল। তাঁর সমাধি ভঙ্গ হল। ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যোগীরাজকে ব্যুত্থিত করবার জন্য যৌগিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে লাগলেন।

যোগীরাজ গোবিন্দপাদের সহস্র বছরের সমাধিভঙ্গ হওয়ার খবরটি দ্রুত চারিদ্বিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবিলম্বে বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ সেখানে এসে যোগীরাজকে দর্শন করবার জন্য সমবেত হলেন।

গোবিন্দপাদ শঙ্করের পরিচয় জেনে বুঝলেন, ইনিই সেই শিবাবতার শঙ্কর। যাকে অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করার জন্যই তিনি এইস্থানে সহস্র বছর ধরে অপেক্ষারত আছেন।

এক শুভদিনে গোবিন্দপাদ শঙ্করকে বিধিসম্মতভাবে দীক্ষা প্রদান করে তাঁকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করলেন। গুরুগোবিন্দপাদ্‌ শঙ্করকে প্রথম বছরে হঠযোগের শিক্ষা দিলেন। শঙ্কর বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দ্রুত সিদ্ধিলাভ করলেন হঠযোগে।

দ্বিতীয় বছরে শঙ্কর রাজযোগে সিদ্ধ হলেন। তৃতীয় বছরে গুরুগোবিন্দপাদ শঙ্করকে বিশেষ যত্নসহকারে জ্ঞানযোগ শেখালেন। ধ্যানবলে শঙ্করের নিত্যনতুন দিব্য অনুভূতি হতে লাগল।

তৃতীয়বছর শেষ হওয়ার আগেই শঙ্করের সকল বিষয়ে যোগশিক্ষা সমাপ্ত হল শঙ্কর এখন সেই দিব্য দুর্লভ অবস্থাতেই বিরাজমান।

এখানে সকলের অবগতির জন্য জানাই, শঙ্কর গুরুগোবিন্দপাদের নিকট যে যোগ-শিক্ষা লাভ করেন, তাঁর গুরুপম্পরা হচ্ছে,—নারায়ণ—ব্রহ্মা বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাসদেব, শুকদেব, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ ও শঙ্কর।

সবারই প্রায় জানা আছে আচার্য্য শঙ্কর পরবর্তীকালে যে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, আমাদের আশ্রমও তারমধ্যে একটি। যদিও আমাদের আশ্রম হল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—অতএব গুরুপরম্পরায় শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত মন্ত্রও স্বয়ং নারায়ণের প্রদত্ত।

এইভাবে ক্রমে আপনাদের জানাবো শ্রীশ্রীবালেশ্বরী মা'কে কীভাবে আমরা আচার্য্য শঙ্করের পরম্পরায় পেলাম।

শঙ্করের শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর গুরুগোবিন্দপাদ আবার গুহাভ্যন্তরে সমাধিস্থ হন।

ক্রমে বর্ষা সমাগত। কয়েকদিন যাবৎ অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে নর্মদার জল স্ফীত হয়ে বন্যার রূপ ধারণ করল। নর্মদাবেষ্টিত ওঁকারনাথের আশপাশের মানুষ, সন্ন্যাসীরা ও গৃহপালিত পশু সমেত সকলেই নিরাপদ উচ্চস্থানে আশ্রয় নিয়েছে। ক্রমে বন্যার জল বাড়তে বাড়তে গুহার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছালো শিষ্যরা গুরুগোবিন্দপাদের জন্য চিন্তিত হয়ে উঠলেন—বৃষ্টির জল যদি গুহামধ্যে প্রবেশ করে তাহলে সমাধিস্থ গুরুদেবকে স্পর্শ করবে। সেইকারণে তাদের মনে হল ওনাকে সমাধি ভঙ্গ করিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে।

সবাইকার এই উদ্বেগ দেখে শঙ্কর একটা মাটির কলসি যোগাড় করে আনলেন এবং সন্ন্যাসীদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না—সকল জল এই কুম্ভ মধ্যে প্রবেশ করবে; গুহায় প্রবেশ করবে না।" এই কথা বলে শঙ্কর কুম্ভটাতে গুহার দ্বার প্রান্তে রেখে দিলেন।

সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল সকল জল কুম্ভমধ্যে প্রবেশ করে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে; গুহা নিরাপদ। ক্রমে বন্যা প্রশমিত হল। গোবিন্দপাদেরও সমাধিভঙ্গ হ'ল—

তিনি সকলের নিকট থেকে এই বৃত্তান্ত শুনে শঙ্করকে বললেন, "বৎস্ তুমিই দেবাদিদের শঙ্করের অংশ শঙ্কর। ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছ। আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি ব্রহ্মাসূত্রের ভাষ্য লিপিবদ্ধ কর।"

জয়গুরু

'রাম নামকা রটন কর—'

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

রাম নামের এক আশ্চর্য জাদু আছে—যে জাদুতে দস্যু রত্নাকর পরিবর্তিত হয়ে গেলেন আদি কবি বাল্মীকিতে। এরপর তো যুগ যুগ ধরে কত সাধু মহাত্মা রাম নাম মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। এনাদের মধ্যে প্রধান একজন হলেন তুলসীদাস; আর এখন অযোধ্যা রামমন্দিরের কথা তো বলাই বাহুল্য। রোজ লাখ লাখ লোক ভক্তিভরে জয় শ্রীরাম বলে দর্শন ও প্রণাম করছেন। ক'দিন আগে আমাদেরও সৌভাগ্য হয়েছিল সেই মন্দির দর্শন করার; রাম যেমন রাজ্য তাঁর মন্দিরও সেরকম রাজকীয়; রামলালা হয়ে সেই মন্দিরে তিনি একাই বিরাজমান; মন্দিরটিও বিশাল—সূক্ষ্ম কারুকাজে ভরা। শুনলাম রাজস্থান থেকে সব কারিগর এসে কাজ করেছে এবং এখনও করছে। মন্দিরের দোতলায় রাম দরবার—সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ; গণ্যমান্য লোকেরাই যেতে পারেন। রাজদরবারে চার ভাই, সীতা, হনুমানজী সকলেই হাজির, জাঁকজমকে ভরা ঝক্‌মকে সেই রাজদরবার।

এবার আসি আমাদের বড় মহারাজজীর 'সতাং প্রসঙ্গে', যেখানে রাম নাম জপ করার একটি সুন্দর গল্প আছে। আজ সেই গল্পটিই আপনাদের শোনাব।

কোনও এক ধনী ব্যক্তির ওপর এক সাধুজীর কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল। তিনি ধনী ব্যক্তিটিকে বললেন, 'বাবু' রাম নাম কর'; বাবুটি উত্তর দিল, ''নানা আমি রাম নাম করতে পারবনা, আমার নানা কাজে আমি খুব ব্যস্ত, রাম নাম করার ফুরসৎ আমার নেই।'' সাধু দেখলেন—এতো একদম ধনমদে মত্ত হয়ে আছে, একে এই মত্ততা থেকে কীভাবে উদ্ধার করা যায়! ঐ সাধু খুব সাধনশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। সাধনার শক্তি বলে নিজের রূপ পরিবর্তন করে হুবহু ঐ ধনী ব্যক্তির রূপ ধারণ করলেন। ধনী ব্যক্তিটি রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন এবং এই-কথাটি সাধুজী জানতেন। পরদিন যখন ঐ ব্যক্তি গঙ্গাস্নানে গেছেন তখন তার রূপধারী সাধুজী সেই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং এসে তার ছেলেদের বললেন ''দ্যাখো একটা মুস্কিল হয়েছে, আমি গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখি এক বহুরূপী ঠিক আমার রূপ ধারণ করে ও এই একই বেশভূষা পরে ওখানে ঘোরাফেরা করছে, এখানেও, এসে পড়তে পারে, তোমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, ও এলে পরে ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিও। বাড়িতে একদম ঢুকতে দিও না।'' ছেলেরা উত্তর দিল, 'বাবা আপনি যা বলেছেন সেটাই হবে আমরা ওকে বাড়িতে ঢুকতেই দেব না।''

সাধুজী ঘরে ঢুকে ধনী ব্যক্তির পালঙ্কে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ঐ ধনী ব্যক্তি নিজের বাড়িতে ফিরে এল, কিন্তু ছেলেরাতো তাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছেনা, সে খুব আশ্চর্য হয়ে ছেলেদেরকে বলতে লাগল, ''বাছারা, আমিতো গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলাম, এখনি ফিরছি তোমরা আমাকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছনা কেন? আমি তোমাদের বাবা। বাবার সঙ্গে এরকম আচরণ কেউ করে?'' ছেলেরা উত্তর দিল,

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা তোমার সব খবর রাখি। তুমিতো বহুরূপী, আমাদের বাবা ঘরেই আছেন, তুমি এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" এরকমভাবে বেশ কথাকাটি হতে লাগল। শেষে ছেলেরা ওকে বেশ করে দু'চারঘা দিয়ে ভাগিয়ে দিল।

সেই লোকটি আর কী করে, সাধুকে ডেকে পাঠালেন, দুজনের একদম একই চেহারা, কে আসল, কে নকল কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। রাজা খুব মুশকিলে পড়লেন। রাজার এই ভাব দেখে সাধু বললেন, "রাজা সাহের যে আসল লোক সেতো নিজের ঘরের সব খবর সঠিকভাবে বলে দিতে পারবে। এই শুনে রাজা সাহের ভাবলেন, ঠিকইতো যে আসল হবে সেতো সব ঠিক ঠিকই বলে দিতে পারবে। রাজা তখন প্রশ্ন করলেন, 'বলোতো, তোমার বড় ছেলের বিয়েতে কত খরচ হয়েছিল? মেজ ছেলের বিয়েতেই বা কত খরচ করেছিলে? আর তোমার বাড়ি বানানোর সময়েই বা কত খরচ হয়েছিল?

সাধু তাঁর যোগ বিভূতির বলে অতি সহজেই সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিচ্ছেন এবার ধনী লোকাটিকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "আমার সঠিকভাবে কিছু মনে নেই।" সাধু আবারও বললেন, "মহারাজ আপনি আমার হিসেবের খাতা চেয়ে আনুন, দেখুন সেখানে কী লেখা আছে?" রাজা সেই কথা শুনে খাতা চেয়ে পাঠালেন। খাতা এলে দেখা গেল, সাধু যা যা বলছেন, হিসেবে ঠিক তাই তাই লেখা আছে। এতে রাজার আরও বিশ্বাস হল যে সাধুই আসল লোক আর ধনী ব্যক্তি নকল বহুরূপী। রাজার বিচারে যখন কিছু হল না, আসল হয়েও সে নকল সাব্যস্ত হল, তখন ধনী ব্যক্তিটির মনে খুবই দুঃখ হোল—সে ভাবতে লাগল এখন কী করি! সারাদিন অনাহারে কাটালাম, ছেলেদের থেকেও মার খেলাম, নিজের বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দিল। তখন সে গঙ্গার কিনারে দিয়ে দুঃখে কান্নাকাটি করতে লাগল। কিছুদিন পর ঐ সাধুটি আবার সেই ধনী ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে আসল রূপ ধারণ করে বললেন, 'বাবু, এখনতো তোমার ধন সব চলে গেছে। নিজের ছেলেদের হাতে মার খেয়েছ, বাড়ি থেকেও বিতাড়িত হয়েছো। এখন আর কী করবে, এবার রাম নাম বল।' ধনী ব্যক্তিটি সেই শুনে বলল, "হ্যাঁ বাবা, আমার এখন চোখ খুলে গেছে, ধন দৌলত কিছুই আমার নয়, নিজের হলে কী এত দুর্দশা হোত? সব বস্তুই পরমাত্মার। এবার থেকে আমি রাম নাম করব।"

সময় পেলে সবাই রামনাম ভজন করুন—সেটাই বড় মহারাজজীর উপদেশ।

ভগবান তাঁহার সকল ভক্তকেই গ্রহণ করেন ভক্তির ভূমিতে তথাকথিত সকল সামাজিক দৃষ্টিবাদ দিয়া। শ্রীগুরু বা ভগবানের কাছে সকলেই সমান, সকলেই বড় আদরের। সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হলেই শিষ্যকে ভেঙ্গে চুরে গড়ে নেওয়ার ভার তাঁর।

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

পুণ্য-পরশ-পুলক (২৩শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

বাবাকে নিয়ে বেনারসে যাবার কথা তো আগেই বলেছি। সারা রাস্তা মনে হয়েছিল যেন গুরুমহারাজ সঙ্গে রয়েছেন। চোখ বন্ধ করলেই তাঁর উপস্থিতি যেন টের পাচ্ছিলাম। সে সব কথা আগে একবার বলেছি। এখানে সেই স্মৃতিকথা শোনাবো না। এখানে বলবো গুরুমহারাজের স্বরূপের কথা। না না সে স্বরূপ আমি নিজে বুঝতে পারি নি। দেখিয়েছিলেন আমাদেরই গুরুভাই ব্রহ্মচারী বিশ্বাত্মানন্দজী।

যাই হোক, সেবার বেনারসের আশ্রমে যখন পৌঁছলাম, সে সময় বিশ্বাত্মানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আসেন নি। কিন্তু তাঁর ব্যবস্থাপনায় আমাদের কোনও অসুবিধা হয় নি। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁরাই দোতালার একটি ঘর দেখিয়ে দিলেন। সেখানেই ছিলাম। খাওয়া দাওয়া আশ্রমেই করতাম। বিকেলের দিকে ঘুরতে বেরোতাম বাবা মাকে নিয়ে, তারপর সন্ধ্যায় ফিরে এসে আশ্রমের মন্দিরে নিত্য পূজারতি দেখতাম। সে সময় শ্রদ্ধেয় বিভবানন্দজী (ভূতনাথ দা) ওখানেই ছিলেন।

যেদিন পৌঁছেছিলাম, সেদিন বিকেলের দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে এলাম। শুনলাম বিশ্বাত্মানন্দ এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ঘরে গেলাম। ঘরের একদিকের দেওয়াল জুড়ে নীল রঙের সহায়তায় গুরুমহারাজের চমৎকার চিত্র আঁকা। দেখলেই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকে দেখছি যেন। সেই ছবির দিকে তাকিয়েই বিশ্বাত্মানন্দের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এ কথা সে কথার পর গুরুমহারাজের প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ল। কেমন ভাবে বেনারসের আশ্রম তৈরি হল, গুরুমহারাজ প্রথম এসেই কী বলেছিলেন সেই সব নানা কথার পর তিনি একটি চমৎকার কথা বললেন। সেটা শুনে প্রথমে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করার লোভ সামলাতে পারিনি।

শাস্ত্রবাক্য নিয়ে কথা উঠল, উপনিষদ গীতার নানা প্রসঙ্গ এলো, গুরুমহারাজের নির্দেশিত শাস্ত্রবাণীর অর্থও কিছু শুনলাম। তার পরেই তিনি বললেন, 'তবে এ কথা বলা যেতেই পারে যে, আমরা, যাঁরা গুরুমহারাজের সান্নিধ্য করেছি, তাঁরা সকলেই ব্রহ্মদর্শী। হ্যাঁ আমরা পরব্রহ্মকে দর্শন করেছি।' স্বাভাবিক ভাবেই আমার ঠোঁটের কোণে একটা হাসি দেখা দিল। বললাম, 'সেটা তো গুরুপ্রণাম মন্ত্রের সূত্রেই বলতে পারি। তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম।' তিনি বললেন, 'সেটা নয়। সেটা নয়, সে তো অবশ্যই তিনি যখন আমাদের গুরু, তখন তিনি পরমব্রহ্ম। কিন্তু সেটা নয়। আমি বলতে চাইছি, সত্যি সত্যিই তিনি পরব্রহ্মস্বরূপ।' এরপর আমি চুপ করে তাঁর কথার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি বললেন, শাস্ত্র মতে, যিনি ব্রহ্মবিদ্— ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন; তিনি নিজেই ব্রহ্মের স্বরূপ হয়ে যান। শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। আমাদের গুরুমহারাজ তো ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ। ফলে তিনি তো স্বয়ংই পরম ব্রহ্ম। আর আমরা তো তাঁকেই দর্শন করেছি, স্পর্শ করেছি, প্রণাম করেছি। সেই দিক থেকে কিন্তু আমরা সকলেই ব্রহ্মদর্শী। হ্যাঁ অবশ্যই তার ফল প্রত্যেকের সুকৃতীর ওপর নির্ভর করে। তবে এ কথা ঠিক

যে আমরা প্রত্যেকেই ব্রহ্মদর্শী। তাই না? বললাম, কিন্তু ব্রহ্মকে তো চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না। তা ছাড়া তাঁর কাছে গেলেও তো আর নিজের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। এই শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় নুনের পুতুলের সমুদ্রে নাইতে যাবার অবস্থা হয়। কিন্তু গুরুমহারাজকে তো আমরা দু চোখে দেখেছি, তাঁর কীর্তন, বাণী নিজেদের কানে শুনেছি।'

তিনি বললেন, ঠিকই তো। তাঁকে দেখেছি, তাঁকে ছুঁয়েছি, তাঁকে প্রণাম করেছি, তাঁকে শুনেছি। তবু তিনিই স্বয়ং পরমব্রহ্মস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মবিদ্।

গুরুমহারাজ ব্রহ্মবিদ্ এ কথায় তো কোনও দ্বিমত নেই, থাকলেও তা বলার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু তাঁকে যখন দেখি, প্রত্যক্ষ করি, দু হাতে সেবা করি, তখন কী তাঁকে পরমব্রহ্ম হিসেবে দেখি।

এ কথার উত্তরে তিনি বললেন, "ব্রহ্মকে তো দেখি না। যেটা দেখি সেটা হল গুরুমহারাজের নরবপু। ভগবানের মন্দির, ব্রহ্মের মন্দির। সেই মন্দিরের মধ্যেই যে পরমব্রহ্ম অবস্থান করছেন, তা কিন্তু আমরা সবাই অনুভব বা উপলব্ধি করেছি।" কি রকম?

প্রথম লক্ষণ হল, তাঁর কাছে গেলে আর চাওয়া পাওয়ার কিছু থাকে না। ওই যে, একটু আগে বললে না, নুনের পুতুলের অবস্থা, ওই অবস্থা হয় আমাদের। আমাদের নিজের বলতে তখন আর কোনও ভাবনাই থাকে না। অল্প সময়ের জন্যে হলেও মনে কোনও ইচ্ছেই থাকে না, শুধু 'জয়গুরু', 'জয়গুরু' ধ্বনিটা কোনও রকমে মনের মধ্যে জেগে ওঠে। কখনও আবার সেটাও থাকে না। বাক, চিন্তা, কর্ম সব লোপ পেয়ে যায়। মনের ভেতর থেকে কেমন একটা ভাব জেগে ওঠে। মনে হয় চারপাশে আর কিছু নেই, কেউ নেই, শুধু আমি আর তিনি। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য সম্বিত ফিরে পাই। তাঁর একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর আগে পর্যন্ত মনের মধ্যে যত কথা যত বাসনাই থাক না কেন, ওই গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে গেলে আর কোনও ইচ্ছা অনিচ্ছাই কাজ করে না। কেন করে না? কারণ পরমব্রহ্ম সমুদ্রের মধ্যে আমরাও তখন পড়ে যাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমাদের সম্বিত তিনি ফিরিয়ে দেন। নইলে তো সংসার চলবে না।

তাঁর এই কথা শোনার পর আমার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরলো না। ব্রহ্মদর্শী আখ্যা পাওয়ার লোভেই হোক বা যে কোনও কারণেই হোক, এ নিয়ে আর তর্কই করলাম না। তবে তাঁর কথার যাথার্থ বুঝতে পারলাম পরের বছর নবদ্বীপে এক ধর্মসভায় গিয়ে। সেখানে একজন বক্তা একজন পাগল ভক্তের কথা বলছিলেন। সেই ভক্ত গান লিখতে পারতেন। একবার তাঁকে ভগবান দেখা দিয়ে বললেন, 'আমায় কেমন দেখতে একটু গান লিখে দাও।' তা ভগবানের কথা শুনে তিনি লিখলেন, 'অধরং মধুরম্।' ভগবান পড়ে বললেন, 'আর একটু লেখ না।' তিনি লিখলেন, 'নয়নং মধুরম্।' 'বেশ বেশ, আর একটু লেখো।' আবারও লিখলেন, 'বদনং মধুরম্।' ভগবান বললেন, বাঃ বাঃ, আর কিছু লেখো। ভগবানের এই কথা শোনার পর সেই ভক্ত কেবল লিখতে পারলেন, 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।'

আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাই তো! গুরুমহারাজের বর্ণনা করতে গেলে ওই 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্' ছাড়া আর তো কিছুই লেখা সম্ভব নয়। কেন না, সমস্ত ভাব অনুভাব বিভাব সঞ্চারী সব; সব তখন শেষ হয়ে গিয়ে কেবল মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকে কেবল ওইটুকুই; 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্'।।

(ক্রমশঃ)

'জয়গুরু' ধ্বনি মাহাত্ম্য

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

আমার এক গুরুবোনের পাঠানো একটি পোস্ট থেকে আজকের এই লেখাটির অনুপ্রেরণা পেলাম—সে লিখেছে, "একটি শিশু যেমন বিপদ-আপদের চিন্তা না করে কেবল তার মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে, আমাদের আধ্যাত্মিক পথ চলাও তেমনি হওয়া উচিত। যখন ভক্তের হৃদয়ে শিশুর মতো এই ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, তখন স্বয়ং শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী তাকে রক্ষা করতে ছুটে আসেন"—

আমি বলব শুধু ছুটেই আসেন না বরং উদ্ধারও করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বড় শক্ত বুঝা—যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।' আজ গুরুপূর্ণিমা আগত প্রায়, জানিনা' তাই কী এত গভীরতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে সদা-সর্বদাই—নাকী এই পরিবর্তনশীল জগতের বিভিন্ন আশ্রমিক, পারিপার্শ্বিকতা আমাদের মন কে উদ্বেলিত করে তুলছে কী হবে আর কীইবা হতে চলেছে? অতীত আমাদের জানা কিন্তু বর্তমানে যা ঘটছে তা দেখেতো আর ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে গুরুমহারাজজী আমাদের একটি বীজমন্ত্র অন্তরে দিয়েই রেখেছেন যে 'স্মরণ'ই সঙ্গ। এমন সদগুরু এমন জীবনকাণ্ডারী আমরা নিজেদের জীবনে পেয়ে যদি ধর্মজীবন যাপন করতে না পারি, জীবনে তাঁর উপযোগিতা, প্রয়োজনিয়তা অনুভব করতে না পারি তাহলে আমাদের তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় পেয়েও ব্যর্থ জীবন বয়ে বেড়ানো ছাড়া আর উপায় কী? অবশ্য তিনি গানে গানে আমাদের কতইনা সহজ পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। নাম কীর্তনে আসক্তি আনয়নের চেষ্টা করে গেছেন আর এই আসক্তি থেকেই-প্রীতির অঙ্কুর জন্মায়। ভক্তির পরাকাষ্ঠা হল প্রেম। তিনি গাইতেন—"কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে, তবু তো চেতনা নাহিরে..."। আমাদের প্রয়োজন সাধনা করার, সাধুকে পাবার শক্তি বৃদ্ধি করার। আমাদের 'সাধ' আছে সাধুসঙ্গ করার অথচ সাধনা নেই—আসলে নিষ্ঠাই বা অধিকাংশের কোথায়?

অথচ তারপরেও স্বয়ং গৌরাঙ্গ দেবের মত তিনি সাধারণের জন্য কত সহজ পথ দেখিয়ে দিলেন—স্মরণই সঙ্গ। আর আমরা প্রত্যেক ভক্তশিষ্য বহুবার বহুভাবে তা উপলব্ধি করেছি। আমি অন্ততঃ দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি এখানে—একবার, তা মনে হয় ২০০৬ সাল হবে। আমার ছেলে তার কর্মস্থলে ফিরে যাবে, রাত আড়াইটায় রিপোর্টিং সময়। ও কিছুতেই বেশি আগে বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না। সেইজন্য আমরা রাত একটা নাগাদ ওকে নিয়ে বড় একটা 'সুমো' গাড়িতে এয়ারপোর্টের পথে রওনা হলাম। সঙ্গে বাড়ির লোক ছাড়াও বাইরের আর একজন ছিল—যদিও তাকে বাড়ির লোকই বলা চলে, মহারাজ জীর প্রতি তার খুব বিশ্বাস ছিল। হঠাৎই ঢাকুরিয়া ব্রীজে ওঠবার সময় আমি দেখলাম দুটো ট্যাক্সিও আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে; যেতেই পারে; আমার কী মনে হল কোনও কথা না বলে 'গুরু গুরু' জপ করতে থাকলাম। ব্রীজ থেকে নেমেই আমাদের আর একটা ব্রীজে ওঠার কথা এবং ঐটাই তো

আমাদের যাবার রাস্তা। দেখছি তিনটে ট্যাক্সি ঐ ব্রীজের মুখটাকে পুরো আটকে দিল, আমি তৎক্ষণাৎ চালককে বললাম কোনও কথা নয় ব্রীজের তলা দিয়ে এক্ষুণি সোজা গাড়ি নিয়ে দৌড়াও, সবার প্রাণে তখন ভয়, শ্বাস রোধ হয় হয়। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে চীৎকার করে করে বলতে লাগলাম জয় গুরু জয়গুরু জয়গুরু—যাকে বলে প্রাণপণে ডাকা; সবাই-এর বদ্ধমূল ধারণা ডাকাতের কবলে পড়লাম আর চালক নীচে দিয়ে গিয়ে গড়িয়াহাট মোড়ের ডান দিকে বাঁক নিয়ে কর্নফিল্ড রোডের দিকে বাঁক নিয়ে যত জোরে সম্ভব গাড়ি ছোটাল। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে আমরা জয়গুরু বলে চীৎকার করতে করতে গেলাম। গুরু মহারাজজী যে কীভাবে বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা' হয়ে আমাদের সেদিন পার করিয়ে দিলেন, তারপরের দিন গড়িয়াহাট থানার খবর যে ঐ রাতে ঐ এলাকায় ডাকাতের দলের খবর ছিল। দু' তিনটি ডাকাতি হয়েছে। এমনকী খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল। তাইতো বলতে ইচ্ছে হয়—"আমি অকৃতি অধম বলেওতো কিছু কম করে মোরে দাওনি"...

আর একটি ঘটনার কথা জানাই। আমার স্বামী বেশ কিছুদিন ধরে সমস্ত কিছু ভুলে যাচ্ছিলেন, বলা যায় প্রায় অ্যালজাইমারের দিকে ঘুরছে ব্যাপারটা। আমরাতো স্ক্যান, ই. ই/ জি, M.R.I কোন কিছুই বাকী রাখিনি করতে। আমার সেই সময় দুটো হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে। ও শেষের বছর দুই ধরে কেবল জপ করতো, অনেকক্ষন সময় ধরে; খেতে দেরী হয়ে যেত। পরের দিকে আর কিছুতেই খাওয়ানো যেত না। আইসক্রীম, কোল্ড ড্রিংক্স এগুলো পছন্দ করত বলে সেই সবের লোভ দেখিয়ে বহু কষ্টে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খাইয়ে গেছি।

যেদিন ওর শ্রীগুরুচরণে ফিরে যাওয়া সেই দিনও আমি রাতে ওকে ডিনার করিয়ে ওষুধগুলো বড় ছিল বলে গুঁড়ো করে চামচে করে খাইয়ে দিয়ে নিজের টেবিলে এসে বসেছি। ওকেও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসিয়ে রাখা আছে, দিনের মাসী ওকে শুইয়ে দিয়ে চলে যাবার তোড়জোড় করছে।

এমন সময় সন্ন্যাসিনী আশাপুরী মায়ের ভাইঝি—চম্পাদি আমাকে ফোন করছেন আমাদের এই দুটো বাড়ির মধ্যে এমন একটা একাত্মতা আছে যেটা কেউ বিশ্বাস ও করতে পারবেননা। বহুবার অনেক রকমের অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে। চম্পাদি বলছেন, "কণিকা, একটা ঘটনা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে এইমাত্র আমাদের বাড়ির ঠাকুরঘরের মস্ত বড় গুরুমহারাজজীর ছবিটা হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে কাঁচটা পুরো ভেঙে গেল আমার খুব ভয় করছে, ব্রজেনবাবু ঠিক আছেন তো?" আমি বললাম তুমি অযথা ভয় পেয়োনা, চিন্তা কোরোনা ঠিক তৎক্ষণাৎ ওর অ্যাটেনডেন্ট আমাকে জোরে ডেকে উঠল—আমি চম্পাদির ফোনটা কেটে দিয়েই ছুটে গিয়ে দেখি আমার স্বামী চোখটা বুঝিয়ে ফেলছে আর সেটা যেন একটু অস্বাভাবিক লাগছে। আমি আবার প্রাণপণে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাতে লাগলাম—"বলো' জয়গুরু, বলো জয়গুরু, বলো জয়গুরু"—আমার এই চীৎকার ওর কানে অবশ্যই পৌঁছেছে এইজন্য বুঝলাম ও অর্দ্ধচক্ষু উন্মীলন করে আমার দিকে তাকিয়েই চোখ বুঝিয়ে ফেলল। ব্যাস, আর কোন সাড়া নেই— আমার ঐ জয়গুরু চীৎকারেইপাড়ার লোকেরা, আমার জা সকলেই ছুটে এসে বলছে ওর কিছু হয়নি জলের ঝাপ্টা দিচ্ছে মুখে—আমি বুঝে গেছি ও আর নেই। আমার যা কানে শোনাবার ছিল শুনিয়ে দিয়েছি। ছেলেকে ফোন করেই আধার কার্ড বার করতে পাশের ঘরে চলে এসেছি। একটা শ্বাসও ওর জোরে পড়েনি, বোঝবার উপায় নেই, এতটুকু মৃত্যু যন্ত্রণা পেলনা। আমার সেই গানটা মনে মনে হল—

"অর্ধ্ব অঙ্গ গঙ্গা জলে, অর্ধ্ব অঙ্গ থাকবে স্থলে—
কেউ বা বলবে হরে হরে আমার মরণ
হবে পুষ্পাঞ্জলি।"

গুরুমহারাজকে শুধু এই কথাটাই বললাম— "তোমার সে ধন দুদিনের তরে
দিয়েছিলে এই আমাদের ঘরে
আজ তব ধন তুমি নিলে কেড়ে,
ছিল না তো সে আমার..."।

আমরা কীর্তন করি দোহার দিই, স্বয়ং গুরুমহারাজজীর কীর্তনেও দোহার দিয়ে কত চোখের জল ফেলেছি; তবুও নিজেদের বিপদকালে এইকথা ভাবতে কষ্ট হয় যে তিনি যা করেছেন, করছেন আর করবেন তা' সবই তাঁর সন্তানদের মঙ্গলের জন্যই, এই বিশ্বাসের জোর আমাদের জীবনে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে। যদি

"পথ ভুলে যাই দয়া করে তাই তুমি মোর
সাথে রহ...হেগুরু প্রণাম লহ।"

—ঃ জয়গুরু ঃ—

"তোমরা পুতুলখেলা কেন করো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে? তোমরা তো জানো এসব মিথ্যা, তবু তাদের মনোরঞ্জনের জন্য পুতুলখেলার যোগাড় করো। তেমনি আমরাও লোকশিক্ষার জন্য, চিত্তশুদ্ধির জন্য সৎকর্মের ভিতর যেন তারা (শিষ্যরা), থাকে, তার জন্য জপ, নিয়ম, ব্রত, পূজা, তীর্থ—এই যেসব বাহ্যকর্ম, তাতে প্রেরণা দিই। কেননা সব সাধনার প্রথম উদ্দেশ্য হলো চিত্তশুদ্ধি। চিত্তের ভেতর কামনা-বাসনা যতদিন থাকবে, সব কামনা-বাসনা যাতে আমরা ভগবানে অর্পণ করতে পারি— এভাবে আমাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য, আমাদের উপকারের জন্য জ্ঞানী যাঁরা, প্রবুদ্ধ যাঁরা কিংবা ভগবানের পরম ভক্ত যাঁরা তাঁরা আমাদের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন— সেইজন্যই তাঁদের সগুণ সাধনা।

ভগবানের পরিচয় তো আমাদের জানা নেই। তবে ভগবান বললেন, যেখানে সৌন্দর্য দেখছো, যেখানে আকর্ষণ দেখছো, যেখানে তোমার অন্তরে একটা পবিত্রভাব জাগে যাঁর কাছে গেলে— তাঁকেই গুরু বলে গ্রহণ করতে পারো।

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

"চেতনার সন্ধান"

শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে রহস্যময় এবং সবচেয়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান হলো নির্মল হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরকে খোঁজা। এই অনুসন্ধান বাইরের জগতে যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তরের গহীনে। মানুষ যখন নিজের সত্তার দিকে ফিরে তাকায়, তখনই সে অনুভব করে এক অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি—যাকে আমরা ঈশ্বর বলি। এই ঈশ্বর চেতনা কোন নির্দিষ্ট ধর্ম, ভাষা বা সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানব মনের এক সর্বজনীন অনুভব।

হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র সমূহ, বিশেষত গীতা এবং চণ্ডী, এই অন্তরের অনুসন্ধানকে অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এই গ্রন্থ গুলিতে ঈশ্বরকে বাইরের কোন দূরবর্তী সত্তা হিসেবে নয়, বরং অন্তরের মধ্যে বিরাজমান চৈতন্যরূপে উপলব্ধি করতে বলা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন—

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি।"

("ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন।")

এই উক্তির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। এখানে ঈশ্বরকে কোন মন্দিরে, মসজিদে বা গির্জার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, ঈশ্বর মানুষের অন্তরের মধ্যে অবস্থান করছেন। অর্থাৎ মানুষ যখন নিজের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে, তখনই ঈশ্বরের স্পর্শ পায়। এই উপলব্ধি আমাদের শেখায় যে, ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য বাইরে ছুটে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই— প্রয়োজন নেই বিভিন্ন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানোর, নিজেকে জানাই হল ঈশ্বরকে জানা।

অন্যদিকে শ্রীশ্রীচণ্ডী-তে দেবীকে বর্ণনা করা হয়েছে সর্বব্যাপী শক্তি হিসেবে। সেখানে বলা হয়েছে—

"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেভ্যধীয়তে,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

এই মন্ত্রটি, মানুষের মধ্যে ঈশ্বর চেতনার উপস্থিতিকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে। এখানে দেবীকে কোন বাহ্যিক শক্তি হিসেবে নয়, বরং মানুষের চেতনার মধ্যে অবস্থান- কারী শক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের চেতনা, তার অনুভব, তার জ্ঞান-- সব কিছুই ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ।

মানুষ ও ঈশ্বর চেতনার এই সম্পর্ক আসলে একটি অন্তর্লীন সংলাপ। মানুষ যখন নিজের ভিতরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজে— আমি কে? কেন এসেছি এই জগতে? জীবনের উদ্দেশ্য কি?—তখন সে ধীরে ধীরে ঈশ্বর চেতনার দিকে এগিয়ে যায়। এই অনুসন্ধান কোন একদিনে শেষ হয় না, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নতুন রূপে

প্রকাশ পায়।

গীতাতে আরো বলা হয়েছে—

"উদ্ধরেত্ আত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়ে।

("নিজের দ্বারা নিজেকে উন্নত করো, নিজেকে অবনত কোরো না।")

এই বাণী আমাদেরকে শেখায় যে, মানুষের মধ্যেই রয়েছে মুক্তির পথ। ঈশ্বর চেতনা কোন বাইরের দান নয়; এটি মানুষের নিজের মধ্যেই নিহিত। মানুষ যখন নিজের মন, বুদ্ধি এবং আত্মাকে শুদ্ধ করে, তখনই সে ঈশ্বরের সঙ্গে

একাত্ম হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী চন্ডীতে বলা হয়েছে—

"সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে।"

("হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলময়ী, হে শিব রূপা, হে সকল কামনার সিদ্ধিদাত্রী, তোমাকে প্রণাম।")

এই স্তোত্রে দেবীকে সর্বমঙ্গলময়ী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি মানুষের জীবনের সমস্ত কল্যাণের উৎস। কিন্তু এই কল্যাণ কোন বাহ্যিক উপাসনার মাধ্যমে নয়, বরং অন্তরের ভক্তি ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এখানে আবারও বোঝা য়ায় যে, ঈশ্বর চেতনার মুল হল অন্তরের অনুভব।

মানুষের জীবনে যখন দুঃখ, কষ্ট, বিভ্রান্তি আসে তখন মানুষ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় ঈশ্বরকে খোঁজে যাতে সে এই ভবের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। কিন্তু আসলে ওই খোঁজাটাই তাকে নিজের অন্তরের দিকে নিয়ে যায়। এই দুঃখই তাকে শেখায় বাহ্যিক জগত অনিত্য; সত্যিকারের শান্তি ও স্থিরতালাভ করা যায় দেবতার সান্নিধ্যে অন্তরের মধ্যে। তখন মানুষ দেবালয়ে যায়।

গীতাতে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে।—

"যঃ পশ্যতি সর্বত্র সমং ভবতি।"

("যিনি সর্বত্র সমতা দেখেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।")

এই সমতাবোধই হলো ঈশ্বর চেতনার অন্যতম লক্ষণ। যখন মানুষ সকল জীবের মধ্যে একই চৈতন্য কে অনুভব করতে পারে, তখনই সে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়। তখন তার মধ্যে অহংকার, হিংসা, দ্বেষ— এসব কিছুই থাকে না।

এই ধারণা

চণ্ডীতে প্রতিফলিত হয়েছে—

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

("যিনি সকল জীবের মধ্যে শক্তি রূপে অবস্থান করেন।")

এই মন্ত্রটি আমাদের শেখায় যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরীয় শক্তি বিদ্যমান। কেউ দুর্বল নয়, কেউ তুচ্ছ নয়—

প্রত্যেকেই ঈশ্বরের এক একটি প্রকাশ। এই উপলব্ধি মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং নিজেকে চিনতে সাহায্য করে মানুষ ও ঈশ্বর চেতনার সম্পর্কে তাই কোন বাহ্যিক নিয়ম বা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি অন্তরের যাত্রা, যেখানে মানুষ নিজেকে জানার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি

করে। এই যাত্রায় ধর্মগ্রন্থ- গুলি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পথটি মানুষকে অতিক্রম করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ঈশ্বর চেতনা কোন নির্দিষ্ট ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান— সব ধর্মেই এই অন্তরের অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে। পার্থক্য শুধু প্রকাশভঙ্গিতে, মূল সুর একটাই— নিজেকে জানো, তাতেই ঈশ্বর লাভ করবে।

মানুষ যখন নিজের অন্তরের দিকে তাকায় তখন সেই দেখতে পায় তার ভয়, তার আকাঙ্ক্ষা, তার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সেই সঙ্গে সে অনুভব করে এক অদ্ভুত শান্তি, এক গভীর নীরবতা— যা তার সমস্ত অস্থিরতাকে ধীরে ধীরে প্রশমিত করে। এই নীরবতাই হলো ঈশ্বরের স্পর্শ। সর্বশেষে বলা যায়, গীতা ও শ্রী শ্রী চণ্ডী আমাদের যে শিক্ষা দেয়, তা হলো ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে বাইরে নয়, নিজের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। সেই অন্তরের নীরবতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর। মানুষ যখন এই সত্যকে উপলব্ধি করে, তখন তার জীবনের সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে সে একা নয়— তার মধ্যে, তার চারপাশে, সর্বত্র বিরাজমান এক চিরন্তন চেতনা। আর সেই চেতনার সঙ্গেই তার চিরন্তন সম্পর্ক। এই সম্পর্কের নামই— অন্তরের অনুসন্ধান, আর এই অনুসন্ধানের শেষে আছে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার চরম উপলব্ধি। এই উপলব্ধি তাকে এনে দেয় সর্বপ্রকার বন্ধন ভয় থেকে মুক্তি। সে নিজের মধ্যে খুঁজে পায় সমগ্র বিশ্বকে। এটাই হলো মানব জীবনের মূল সুর।

০০০

সত্ত্ব ভূমিতে উঠিতে না পারিলে দরজাতেই পৌঁছন হইল না। প্রকৃত ভক্তি ঐ সত্ত্ব অর্থাৎ চিত্তের সমতা অবস্থাতেই লাভ হয়। সাধুসঙ্গের ফলে চিত্ত নিস্তরঙ্গ হয়। সাধু-সঙ্গ করিয়াও যদি চিত্ত অল্প ঝঞ্ঝাতেই দুলিয়া উঠে, সমভাবাপন্ন না হয়, তবে বুঝিতে হইবে সে চিত্ত জড় বা পাষান। সাধুসঙ্গের মহিমায় চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়া স্থির হইবেই হইবে।

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

"শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ"

এতদ্দ্বারা সকলকে জানানো হইতেছে যে, জামির লেন স্থিত, শ্রীশ্রী বালানন্দ আশ্রম অনিবার্য কারণবশতঃ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। পরবর্তী পরিস্থিতি পুনরায় পর্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যতে শ্রীশ্রী বালেশ্বরী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

—আদেশ অনুসারে

P. Brahmachari

শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রম, দেওঘর (ঝাড়খণ্ড)
Mobile number: 9204142998
Office time: **Monday to Saturday (11 AM to 6 PM)**

Account Details for sending donation

Account Holder Name: **SRI SRI BALANANDA TRUST**
Bank Name: **State Bank of India** (Deoghar Branch),
A/c No.: **11240654640** IFSC: SBIN0000064
Bank Name: **Bank of India** (Deoghar Branch),
A/c No.: **446110100017737** IFSC: BKID0004461

বিশেষ ঘোষণা

১। এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজা সামগ্রী কলিকাতায় অবস্থিত মোহনানন্দ আশ্রম (সল্টলেক অফিসে) শ্রীশ্রী পবিত্রানন্দজীর উপস্থিতিতে সময় 2 PM থেকে 6 PM তারিখ 28/09/2026 থেকে 04/10/2026 গ্রহণ করা হবে।

২। দেওঘর আশ্রমে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঘর বুকিং এর জন্য 9204142998 এই নাম্বার এ তারিখ 10/08/2026 থেকে 12/08/2026 সময় 11 AM থেকে 6 PM পর্যন্ত হবে।

সংসারের নানা কর্ত্তব্যে বা বাধা বিঘ্নে যদি কখনো গুরুর কাছে যেতে না পার, বিরক্ত হোয়ো না। দুটি আছে, "স্বকীয়া ও পরকীয়া"। স্বকীয়ায় তাঁর সুখ যত না হয়, পরকীয়াতেই তাঁর আনন্দের চরম অভিব্যক্তি। এর মানে কি? বাধা বিঘ্ন না এলে ব্যাকুলতার চরম হয় না। আর তাঁর জন্য ব্যাকুল হলেই তিনি ধরা দেবেন।

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

কবিতা

অনুভব
শ্রীফকিরচন্দ্র শুকুল

অন্তর মোর ভরায়ে দিয়েছ, পূর্ণ ক'রেছ সাধ
নব জীবনের পরম লগনে পেয়েছি আশীর্বাদ।
সুখে উল্লাস, দুঃখে কাতর
কারও অবহেলা, কারও বা আদর
বিচলিত যেন না হই কিছুতে এই মাগি পরসাদ।

সংসারে আমি থাকিবারে চাই শুভকর্মের ব্রতে,
চিত্ত তবুও সিঞ্চিত যেন রহে নাম ধারা স্রোতে,
কহি নাক' যেন স্বীয় গৌরব,
অনুভবে থাক্ শুচি-সৌরভ,
আঘাতে, বিষাদে দেহমনে যেন আসে নাক' অবসাদ।।

(পূর্বপ্রকাশিত)

নমামি শ্রীমোহনানন্দ
ডঃ আচার্য মুকুলবিকাশ মিশ্র
(মাতৃমন্দির কালীবাড়ী—নতুন দিল্লী)

শ্রীমোহনানন্দ পরমানন্দং
গুরুং প্রশান্তং ভবভীতিনাশং।
সদাসৌম্যরূপং সদা ঐক্যভাবং
নমামি নিত্যং শ্রীমোহনানন্দম্।।

অজ্ঞাননাশং য়িতপ্রকাশং।
সচ্চিদ্ স্বরূপং করুণাদ্রমূর্ত্তিম্
বিশুদ্ধবোধং কলুষাপহরণং,
গুরুং নমামি শ্রীমোহনানন্দম্।।

প্রেমস্বরূপং হৃদয়ারবিন্দে।
মোক্ষেহি মার্গে সদাচরন্তং।
ত্বং দীননাথং ভবসিন্ধুপোতং—
গুরুং নমামি শ্রীমোহনানন্দম্।।

জানার্তিহারং করুণাবতারং
সদাশ্রিতং ভক্তজনৈশ্চপূজ্যং।
সদাশ্রিতানাং পরমং শরণ্যং
গুরুং নমামি শ্রীমোহনানন্দম্।

ত্বয়া যে প্রোক্তঃ সুগুণা সদৈব।
অস্মানয়ন্তু সদাভক্তিমার্গে—
ধিয়ো নো যাতু তব ধ্যানযোগে,
ন্মোহি নিত্যং চরণারবিন্দে।।

(পূর্বপ্রকাশিত)

সম্পাদকীয়

"তোমারিপুলকহৃদয়ে লাগে"

এটি হল 'গুরুপূর্ণিমা' সংখ্যা। যেহেতু এই আষাঢ়ি পূর্ণিমাতে ব্যাসদেবই প্রথম গুরুরূপে পূজিত হয়েছিলেন—তাই এই নামকরণ। আসলে শ্রীগুরুকে কোনও বিশেষ তিথিতে সীমাবদ্ধ করা যায় না। একবার যদি করুণাময় তাঁর শ্রীচরণে ঠাঁই দেন, তাহলে আর চিন্তা নেই। শিষ্যের তিন জন্মের ভার তিনি হাত পেতে গ্রহণ করেন। কাজেই আমাদের সর্বদাই সতর্ক থাকা উচিত যাতে আমরা তাঁর আদেশানুসারে চলতে পারি, প্রতিটি দিনকেই গুরুর শ্রীচরণে উৎসর্গ করতে পারি। প্রতিটি 'প্রভাতে উঠিয়া স্মরণ করিগো তোমারেই ভগবান'—এই সংকল্প আমাদের নিত্য নৈমিত্তিকের জন্য হওয়া উচিত।

তাঁর প্রকট—'অপ্রকট লীলা' দুই-ই বিধানের কথা তিনি যতই আমাদের বলে যান না কেন, আজও আমরা কিন্তু স্মৃতিপট থেকে মানব-কল্যাণে নিবেদিত কর্মব্যস্ততা পূর্ণ গতিময় অথচ অন্তরে শান্ত-নীরব উদ্বেগহীন শ্রীগুরুকে এই বাক্ সর্বস্ব শব্দময় হুজুগের যুগেও ঠিক আগের মতই নিজেদের অন্তরে বসিয়ে রেখেছি। পবিত্রময়ী গঙ্গা যেমন তাঁর উৎসস্থল থেকে সহস্র সহস্র তরঙ্গমালায় সমুদ্রাভিমুখে ছুটে চলেছেন আর তাঁর কোলে কোলে কতনা নগর নগরী গড়ে উঠেছে; কত আর্তজন শান্তি পাচ্ছেন—বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন নামে পরিচিতা তিনি। "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে, ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে..." তেমনই শান্তির আনন্দ দিয়ে নিজভক্ত—শিষ্যদেরও অন্তরপটে বইয়ে দিতে পেরেছেন শান্তির এক অনন্য স্নিগ্ধ অথচ আবেগে উদ্বেলিত জীবনধারাকে।

মনে পড়ে যাচ্ছে কবিগুরুর কবিতার লাইনগুলি "মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি; মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে...।"

কাজেই তিনি আছেন, আর এই তিথিটিতে প্রত্যেকটি আশ্রমে আশ্রমে তাঁর লক্ষ লক্ষ সন্তানের বাড়িতে—বিদেশে কিংবা স্বদেশে এইদিনটি বিশেষভাবে আজও পালিত হয়ে আসছে অতি ভক্তি সহকারে। দীক্ষাকালে তিনি যে বীজ আমাদের হৃদয়ে প্রোথিত করেছেন আসুন প্রতিদিন আমরা নিজেদের প্রেমাশ্রু দ্বারা তাকে সিঞ্চিত করি যাতে একদিন তা মহীরুহে পরিণত হতে পারে। এখন থেকেই আর 'ধূলার ধরালয়ে'...মেতে না থেকে সবাই মিলে সঙ্কল্প করি, 'মোরা সত্যেরতরে মন আজি করিব সমর্পণ জয় জয় সত্যের জয়।'